অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 241-248
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.034

SADHAN CHOTTOPADHYAYER NIRBACHITO GALPE PORIBESHCHETANAR RUPAYAN : ECOCRITICAL PATH / সাধন চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পে পরিবেশচেতনার রূপায়ণ: ইকোক্রিটিক্যাল পাঠ

NITAI PAUL / নিতাই পাল
গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Email: nitaipaul151098@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:

পরিবেশচেতনা, ইকোক্রিটিসিজম, সাধন চট্টোপাধ্যায়, প্রকৃতি ও মানুষ, পরিবেশ সংকট, নগরায়ণ, সামাজিক বাস্তবতা

Abstract:
আলোচ্য প্রবন্ধে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পসমূহ—'মিশ্র পিলু', 'মেহগনি', 'আবহমান', 'ভোরের আলোয় মধ্যরাত্তির' এবং 'ভেজা-তবলার বোল'—ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হল, এই গল্পগুলিতে পরিবেশচেতনার বহুমাত্রিক রূপকে চিহ্নিত করা এবং বোঝানো যে পরিবেশ কেবল প্রাকৃতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক বাস্তবতার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। প্রতিটি গল্পে প্রকৃতি একটি সক্রিয় উপাদান হিসেবে উপস্থিত, যা কখনও প্রতীকী, কখনও বাস্তব, আবার কখনও দার্শনিক তাৎপর্য বহন করে। 'মিশ্র পিলু'-তে পরিবেশ মানুষের অন্তর্জগৎ ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মিশে এক জটিল বাস্তবতা নির্মাণ করে; 'মেহগনি'-তে প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং মানুষের লোভের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে; 'আবহমান'-এ পরিবেশগত সংকট সরাসরি মানুষের জীবনসংগ্রাম ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত; 'ভোরের আলোয় মধ্যরাত্তির'-এ নগরায়ণ ও যান্ত্রিকতার ফলে প্রকৃতি থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ফুটে ওঠে; এবং 'ভেজা-তবলার বোল'-এ উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংস ও নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবন্ধটি দেখাতে চেয়েছে যে, পরিবেশের সংকট আসলে একটি বৃহত্তর মানবিক সংকট, যা মানুষের জীবন ও সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রভাব ফেলে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পসমূহ এই সংকটকে গভীর শিল্পরূপে উপস্থাপন করে এবং পাঠককে পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্ক সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।

Discussion:

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক আদিকাল থেকেই নিবিড়, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক ক্রমশ জটিল, দ্বন্দ্বময় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। যে প্রকৃতি একসময় মানুষের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল, আজ সেই প্রকৃতিই মানুষের অযাচিত হস্তক্ষেপ, লোভ এবং ভোগবাদী মানসিকতার ফলে গভীর সংকটে নিমজ্জিত। ফলে পরিবেশ আর কেবল বহির্জগতের একটি উপাদান নয়; এটি মানুষের অস্তিত্ব, সমাজব্যবস্থা এবং মানসিকতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় পরিবেশকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠেছে, আর সেই প্রয়োজন থেকেই ইকোক্রিটিসিজম সাহিত্য বিশ্লেষণের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাহিত্য এই জটিল সম্পর্ককে বোঝার একটি গভীর ও সংবেদনশীল মাধ্যম। কারণ সাহিত্য শুধু দৃশ্যমান বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে না; বরং মানুষের অন্তর্জগৎ, সামাজিক কাঠামো, ইতিহাস এবং সময়ের অন্তর্নিহিত সংকটকে নান্দনিক রূপে উন্মোচিত করে। বাংলা কথাসাহিত্যে এই প্রবণতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি সাধন চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) বরিশাল জেলার মাধবপাশার নিকটবর্তী শোলনা গ্রামে তাঁর জন্ম। দেশভাগের অভিঘাতে মাত্র তিন বছর বয়সে পরিবারসহ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে উত্তর ২৪ পরগনার সুকচর-পানিহাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি তিনি বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ—সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ লক্ষ করা যায়। তাঁর সাহিত্যকর্মে গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি, মানুষ, ইতিহাস, সামাজিক রূপান্তর এবং সময়ের সংকট এক আন্তরিক শিল্পবোধের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যসাধনায় তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘বঙ্কিম পুরস্কার’, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘শরৎস্মৃতি পুরস্কার’সহ একাধিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যভুবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে গভীর জীবনবোধের আলোকে অনুধাবন করা। তাঁর গল্পে প্রকৃতি কখনও নিছক পটভূমি নয়, কখনও কেবল সৌন্দর্যের উপকরণও নয়; বরং প্রকৃতি সেখানে মানুষের জীবন, স্মৃতি, সংস্কৃতি, অস্তিত্ব এবং সামাজিক বাস্তবতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক উন্নয়ন, নগরায়ণ, পরিবেশের অবক্ষয় এবং পরিবর্তিত জীবনযাত্রার অভিঘাতে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেই সংকট তিনি সূক্ষ্ম শিল্পবোধের মাধ্যমে গল্পে রূপায়িত করেছেন। এই কারণেই তাঁর গল্পসমূহ ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে বিশ্লেষণের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প—‘মিশ্র পিলু’, ‘মেহগনি’, ‘ভোরের আলোয় মধ্যরাত্তির’ এবং ‘ভেজা-তবলার বোল’—ইকোক্রিটিসিজমের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কীভাবে এই গল্পগুলিতে পরিবেশ কেবল প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে নয়, বরং একটি সামগ্রিক জীবনবাস্তবতা হিসেবে উপস্থিত, যা মানুষের জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি ও মানসিক জগৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

‘মিশ্র পিলু’ গল্পটি মূলত এক বহুমাত্রিক পরিবেশচেতনার শিল্পরূপ, যেখানে প্রকৃতি, সমাজ, সময় এবং মানুষের অন্তর্জগৎ এক সুতোয় গাঁথা হয়ে ওঠে। গল্পের কেন্দ্রে থাকা নলিনাক্ষ যেন এক নীরব দর্শক—কিন্তু তার এই

নীরবতা আসলে গভীর উপলব্ধির ক্ষেত্র, যেখানে চারপাশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য পরিবেশ একত্রে মিশে এক জটিল বাস্তবতার জন্ম দেয়। এই গল্পে পরিবেশ ভাবনা কেবল প্রকৃতির অবক্ষয় নয়, বরং মানুষের মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশের অবনতিরও এক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। গল্পের সূচনাতেই যে ভগ্নপ্রায় বাড়ির বর্ণনা পাওয়া যায়, তা শুধু একটি স্থাপত্যের বিবরণ নয়; এটি সময়ের ক্ষয়, মানুষের অক্ষমতা এবং পরিবেশের অবহেলার প্রতীক। নলিনাক্ষ যে সিঁড়িতে বসে থাকে, সেটি যেন অতীত ও বর্তমানের সংযোগস্থল। একসময় যে বাড়ি ছিল সজীব, যত্নে রক্ষিত, তা এখন অবহেলায় ক্ষয়প্রাপ্ত—এই পরিবর্তন পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পরিবর্তনের দিকটিও স্পষ্ট করে। অর্থাৎ, পরিবেশ এখানে শুধুই বাহ্যিক প্রকৃতি নয়, বরং মানুষের জীবনযাত্রা ও মানসিকতার প্রতিফলন। প্রকৃতির অস্বাভাবিক রূপান্তর গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে এসেছে। ঋতুচক্রের অসামঞ্জস্য—যেমন নভেম্বরের শেষে শীতের অনুপস্থিতি—শুধু একটি আবহাওয়াগত পরিবর্তন নয়, বরং প্রকৃতির গভীর অসুস্থতার লক্ষণ। নলিনাক্ষ যখন অনুভব করে যে ঋতুর সঙ্গে সময়ের আর মিল নেই, তখন তা বর্তমান যুগের পরিবেশ সংকটের এক প্রতীকী প্রকাশ। এখানে লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হস্তক্ষেপ প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দকে ভেঙে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে গল্পের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—"মানুষকে নতুন বসত গড়তে গিয়ে, প্রকৃতিকে ধর্ষণ করতে হয়েছে।"[১] এই বাক্যটি পুরো গল্পের পরিবেশ ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে 'ধর্ষণ' শব্দটি ব্যবহার করে লেখক যে তীব্রতা প্রকাশ করেছেন, তা নিছক অলংকার নয়; এটি মানুষের উন্নয়ন-লোলুপতার নির্মম বাস্তবতাকে নগ্ন করে দেয়। জলাভূমি ভরাট, বনভূমি ধ্বংস, প্রাণবৈচিত্র্যের বিলুপ্তি—এসবই আধুনিক সভ্যতার তথাকথিত অগ্রগতির মূল্য। ফলে পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্ক আর সহাবস্থানের নয়, বরং শোষণ ও আধিপত্যের হয়ে দাঁড়িয়েছে। গল্পে হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর উল্লেখ পরিবেশ ভাবনাকে আরও গভীর করে তোলে। কালকাশুন্দি, পাথরকুঁচি, যজ্ঞডুমুর কিংবা বৌ-কথা-কও, হরিয়াল—এই সব নাম উচ্চারণের মধ্য দিয়ে লেখক এক হারানো প্রকৃতির স্মৃতি ফিরিয়ে আনেন। এগুলো নিছক নস্টালজিয়া নয়; বরং একটি সতর্ক সংকেত, যা জানিয়ে দেয় যে মানুষের অগ্রগতির পথে প্রকৃতি ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নলিনাক্ষর শৈশবের প্রকৃতি আর বর্তমানের প্রকৃতির এই তফাৎ পরিবেশের ক্রমাবনতিরই প্রতিফলন। তবে গল্পে পরিবেশ ভাবনা কেবল প্রাকৃতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়; সামাজিক পরিবেশও এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ। জগদীশবাবু, দীনুবাবু, ভোলা, কালী, বিনি—এই চরিত্রগুলো প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সামাজিক বাস্তবতার প্রতিনিধি। তাদের জীবনযাপন, মানসিকতা ও আচরণের মধ্যে দিয়ে সমাজের জটিল পরিবেশ ফুটে ওঠে। জগদীশবাবুর চরিত্রে আমরা দেখি এক দ্বৈততা—তিনি ধর্মীয় আচারে বিশ্বাসী, কিন্তু একই সঙ্গে লোভ ও সংকীর্ণতায় আবদ্ধ। তার এই দ্বন্দ্ব সামাজিক পরিবেশের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতীক। অন্যদিকে দীনুবাবু এক আদর্শবাদী মানুষ, যিনি ন্যায়বিচার ও নীতির প্রতি আস্থাশীল। কিন্তু বাস্তব সমাজে তার এই বিশ্বাস বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ে। তিনি পরিবর্তনশীল সময়কে মেনে নিতে পারেন না, ফলে তার মানসিক পরিবেশ এক ধরনের দ্বিধা ও অসহায়তায় ভরপুর। এই চরিত্রগুলোর মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, সামাজিক পরিবেশও প্রকৃতির মতোই পরিবর্তনশীল এবং অনেক ক্ষেত্রেই অসুস্থ। কলোনির মানুষের জীবনচিত্র গল্পে পরিবেশ ভাবনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর উন্মোচন করে। তারা প্রকৃতিকে জয় করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে—জলাভূমি দখল করে বসতি গড়েছে, কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই সংগ্রামের ফলে তাদের জীবন হয়ে উঠেছে রূঢ় ও কঠিন। তবুও সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি বা ধর্মীয় আচারের মধ্যে দিয়ে তাদের অন্তরের কোমলতা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। এই দ্বৈততা পরিবেশের জটিলতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি হল—"মানুষগুলোর হৃদয়ের কোথায় কী যেন জোনাকির মত টিপ টিপ করে জ্বলছে।"[২] এই বাক্যটি মানবিকতার ক্ষীণ অথচ অমর আলোকে নির্দেশ করে। কঠোর জীবনসংগ্রাম, দারিদ্র্য ও নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যেও

মানুষের হৃদয়ে একটুকরো কোমলতা, একটুকরো সঙ্গীত বেঁচে থাকে। এই দিকটি পরিবেশ ভাবনাকে একটি মানবিক ও দার্শনিক উচ্চতায় নিয়ে যায়। ভোলা ও কালীর জীবনচিত্রে আমরা দেখি অর্থনৈতিক পরিবেশের নির্মমতা। তারা জীবিকার তাগিদে অবৈধ কাজ করে, কিন্তু তাদের মধ্যে মানবিক অনুভূতি সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। একইভাবে বিনি ও লক্ষ্মীর কাহিনিতে মানসিক পরিবেশের গভীরতা ফুটে ওঠে। লক্ষ্মীর অপ্রকাশিত প্রেম, বিনির সংগ্রামী জীবন—এসবই দেখায় যে পরিবেশ শুধু বাহ্যিক নয়, মানুষের অন্তর্জগতেও তার গভীর প্রভাব রয়েছে। গল্পের শেষাংশে 'মিশ্র পিলু' রাগের প্রতীকী তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রাগের আলাপ, বিস্তার ও দ্রুতি যেন জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। নলিনাক্ষ উপলব্ধি করে যে মানুষের জীবন, সমাজ এবং পরিবেশ—সবকিছুই এক ধারাবাহিক সুরের মতো এগিয়ে চলে। কখনো ধীর, কখনো দ্রুত, কিন্তু কখনো থেমে থাকে না। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরিবেশ ভাবনা একটি দার্শনিক মাত্রা পায়। তাই বলা যায়, 'মিশ্র পিলু' গল্পে পরিবেশ ভাবনা বহুমাত্রিক ও গভীর। এখানে প্রকৃতির অবক্ষয়, সামাজিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং মানসিক জটিলতা—সবকিছু মিলিয়ে এক সামগ্রিক পরিবেশের চিত্র ফুটে উঠেছে।

'মেহগনি' গল্পটি ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি, এখানে প্রকৃতি শুধু পটভূমি নয়—এটি গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মতো কাজ করে। মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতির সম্পর্ক এই গল্পে গভীরভাবে জড়িত। ইকোক্রিটিসিজম মূলত এই সম্পর্ককেই বোঝার চেষ্টা করে—মানুষ কীভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে, শোষণ করে, আবার কখনো তার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। গল্পের শুরুতেই আমরা খরাগ্রস্ত এক পরিবেশ দেখি। চারদিকে শুকনো জমি, জ্বলন্ত ঘাস, পানি নেই—সব মিলিয়ে প্রকৃতির এক ক্লান্ত, নিঃস্ব চেহারা ফুটে ওঠে। এই অবস্থাটি শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বরং মানুষের অবহেলা ও লোভের ফলও বোঝায়। যখন বলা হয়—"ঘাস জ্বলছিল, নদী-তালাও ছিল শুকনো হাড়ের করোটি"[৩]—তখন মনে হয় প্রকৃতি যেন মৃতপ্রায়, তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই বর্ণনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে মানুষ প্রকৃতিকে যত বেশি শোষণ করে, প্রকৃতিও তত দুর্বল হয়ে পড়ে। এই শুষ্ক পরিবেশের মাঝেই মেহগনি গাছটি এক বিশেষ প্রতীক হয়ে ওঠে। এটি শুধু একটি গাছ নয়, বরং শক্তি, স্থায়িত্ব ও প্রকৃতির নিজস্ব অস্তিত্বের প্রতীক। লেখক গাছটিকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যেন এটি জীবন্ত—"মানুষকে ঘাড়-কাত করানো আস্পর্ধায় গুঁড়ির মেজাজটা পাহাড়; পাতা, শাখা আর তার জটাজাল-এই বাগানের আকাশ যারা আঁকি-বুকি দিয়ে রেখেছে।"[৪] এই বর্ণনায় গাছটি যেন নিজের শক্তি ও সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের বাইরে এক স্বাধীন সত্তা হিসেবে। ইকোক্রিটিসিজমে প্রকৃতিকে এভাবেই দেখা হয়—মানুষের অধীন নয়, বরং সমান গুরুত্বপূর্ণ এক অস্তিত্ব। দারোগা পাণ্ডে চরিত্রটি মানুষের লোভ ও ক্ষমতার প্রতীক। তার কাছে মেহগনি গাছটি শুধু কাঠ—যা দিয়ে আসবাব বানানো যাবে, সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। সে গাছের জীবন্ত অস্তিত্ব বা তার পরিবেশগত গুরুত্ব বোঝে না। তার চোখে শুধু লাভ-ক্ষতি। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বাস্তব জীবনের একটি বড় সমস্যার প্রতিফলন, যেখানে মানুষ প্রকৃতিকে শুধু 'ব্যবহারযোগ্য জিনিস' হিসেবে দেখে। অন্যদিকে বুধান মুসাহার সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার মানুষ। সে গাছটির সঙ্গে এক ধরনের আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করে। গাছটি তার কাছে শুধু সম্পত্তি নয়, জীবনের অংশ। তাই দারোগা যখন গাছটি নিতে চায়, বুধান দ্বিধায় পড়ে। তার এই মনোভাব দেখায় যে প্রান্তিক মানুষরা অনেক সময় প্রকৃতির সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। তারা প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়। গল্পে খরা ও সামাজিক শোষণের সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ। খরার কারণে যখন ফসল নষ্ট হয়, তখন বড়লোক ব্যবসায়ীরা ক্ষতির জন্য গরিবদের দায়ী করে। মুসাহারদের ওপর অত্যাচার করা হয়। এখানে দেখা যায়, প্রকৃতির সংকটের বোঝা সবচেয়ে বেশি পড়ে দুর্বল মানুষের ওপর। এটি একটি বড় সামাজিক বাস্তবতা—যেখানে

পরিবেশের ক্ষতি সবার ওপর সমানভাবে পড়ে না। মুসাহার টোলায় আগুন লাগানোর ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু মানুষের ওপর অত্যাচার নয়, তাদের পরিবেশ ও জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ ধ্বংস। আগুনে ঘরবাড়ি পুড়ে যায়, জীবনের সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনাটি দেখায়, মানুষের লোভ ও ক্ষমতার লড়াই শুধু মানুষকেই নয়, পুরো পরিবেশকেই ধ্বংস করে। গল্পের শেষে আমরা দেখি, সব ধ্বংসের মাঝেও মেহগনি গাছটি অটল দাঁড়িয়ে আছে। "আদিম বৃক্ষ, প্রাচীন বল্কল, গভীর... ঝড় ও রৌদ্রের শাসন উপেক্ষা করে আপন মূল গ্রথিত"[৫]—এই বর্ণনায় গাছটি প্রকৃতির স্থায়িত্ব ও সহনশীলতার প্রতীক হয়ে ওঠে। মানুষ যতই ধ্বংস করুক, প্রকৃতি তার নিজের শক্তিতে টিকে থাকার চেষ্টা করে। দারোগা পাণ্ডে শেষ পর্যন্ত গাছটি নিতে পারে না। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়, মানুষ সবসময় প্রকৃতিকে পুরোপুরি নিজের দখলে নিতে পারে না। প্রকৃতির নিজস্ব শক্তি ও স্বাধীনতা আছে, যা মানুষের লোভের চেয়েও বড়। সব মিলিয়ে, 'মেহগনি' গল্পটি আমাদের শেখায় যে প্রকৃতিকে শুধু ব্যবহার করার বস্তু হিসেবে দেখলে শেষ পর্যন্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানই টিকে থাকার একমাত্র পথ। মেহগনি গাছটি এই সত্যের প্রতীক—নীরব, শক্তিশালী এবং মানুষের বাইরে নিজের অস্তিত্বে অটল।

'ভোরের আলোয় মধ্যরাত্তির' গল্পটি প্রথম দর্শনে একটি পুলিশ অফিসার অখিলেশ্বরের জীবন, ক্ষমতা, স্মৃতি ও মানসিক রূপান্তরের কাহিনি বলে মনে হলেও, গভীরভাবে পাঠ করলে এতে একটি সুস্পষ্ট পরিবেশ-ভাবনা বা ইকোক্রিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যায়। গল্পের তৃণভূমি, অন্ধকার, আলো, প্রকৃতি, নগরায়ণ এবং মানুষের মানসিক অবস্থার মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যা পরিবেশ ও মানুষের অস্তিত্বগত সম্পর্ককে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি ভোরের আলো এবং মধ্যরাতের অন্ধকারের এক অদ্ভুত দ্বৈততা। জ্যৈষ্ঠ মাসের দীর্ঘ দিনের ভোরবেলা যখন সূর্যের আলো মাঠ-ঘাট আলোকিত করে, তখন একই জায়গা আবার গভীর অন্ধকারে ঢেকে যায়। এই আলো-অন্ধকারের বিন্যাস প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দকে তুলে ধরে, যা মানুষের জীবনের বাইরের একটি বৃহত্তর চক্রের অংশ। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার মধ্যে হঠাৎই ঢুকে পড়ে মানুষের হস্তক্ষেপ—জিপ, অস্ত্র, পুলিশি অভিযান। ফলে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়, এবং একটি অস্বস্তিকর টানাপোড়েন তৈরি হয়। তৃণভূমি এই গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এটি শুধু একটি খোলা জায়গা নয়, বরং শহরের 'ফুসফুস' হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ, এটি এমন একটি স্থান যেখানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, শ্বাস নিতে পারে, জীবনের ভার লাঘব করতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে এই তৃণভূমিই অপরাধ, লুকোচুরি, এবং ক্ষমতার খেলার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ফলে প্রকৃতি এখানে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে—একদিকে আশ্রয়, অন্যদিকে সংঘাতের মঞ্চ। গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন আছে—"এই তৃণভূমিটাই শহরের একমাত্র খোলামেলা, ফুসফুস। আর সব নিরেট হয়ে গেছে।"[৬] এই উক্তিটি আমাদের শহরায়নের ভয়াবহ দিকটি স্পষ্ট করে। শহর ক্রমশ কংক্রিটে ঢেকে যাচ্ছে, খোলা জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতির উপস্থিতি সংকুচিত হয়ে আসছে। ফলে মানুষ বাধ্য হচ্ছে সীমিত কিছু প্রাকৃতিক পরিসরের ওপর নির্ভর করতে। এই তৃণভূমি তাই শুধু একটি স্থান নয়, বরং একটি অস্তিত্বের প্রতীক, যা হারিয়ে যাওয়ার পথে। অখিলেশ্বর চরিত্রটিও এই পরিবেশগত সংকটের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তার অতীত জীবনে আমরা দেখি, সে প্রকৃতির সঙ্গে এক ধরনের কল্পনাময় সংযোগ স্থাপন করত। পরীদের প্রতি তার বিশ্বাস, নির্জনতার মধ্যে অন্য এক জগতের অনুভব—এসব তার প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল মনোভাবের পরিচায়ক। সে বিশ্বাস করত, দৃশ্যমান জগতের বাইরে আরও কিছু আছে, যা প্রকৃতির গভীরে লুকিয়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তার একটি উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ— "এই শব্দময় পৃথিবীর মধ্যে নির্জনতার একটি জগৎ লুকিয়ে আছে, যা আমাদের চোখের সামনে উঠে এলে, অনেক কিছু প্রচলিত ধারণাই পালটে যাবে।"[৭] এই বক্তব্যে

প্রকৃতির প্রতি এক ধরনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। এখানে প্রকৃতি শুধু দৃশ্যমান বস্তু নয়, বরং একটি রহস্যময়, গভীর এবং অন্তর্লৌকিক বাস্তবতা। কিন্তু সমাজ এই অনুভূতিকে স্বীকৃতি দেয় না। বরং তাকে বিদ্রূপ করে, অপমান করে, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সমাজচ্যুত করে। এই জায়গাতেই গল্পটি ইকোক্রিটিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, এখানে দেখা যায় কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ থাকা একজন মানুষ সমাজের চোখে 'অস্বাভাবিক' হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, আধুনিক সমাজ প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ককে গ্রহণ করতে পারে না। বরং তাকে দমন করে, উপহাস করে। অখিলেশ্বরের পরবর্তী জীবনে আমরা দেখি, সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সে এখন রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি অংশ, একটি 'স্ক্রু'। তার মধ্যে আর সেই সংবেদনশীলতা নেই, বরং আছে কঠোরতা, নির্মমতা এবং যান্ত্রিকতা। এই রূপান্তরটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিফলন। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ কীভাবে যন্ত্রে পরিণত হয়, তা এখানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পে জিপের বর্ণনাটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জিপটিকে একটি 'মাংসহীন খাঁচা' হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা যেন জীবন্ত অথচ নিষ্ঠুর। এটি প্রকৃতির বিপরীতে দাঁড়ানো এক যান্ত্রিক শক্তির প্রতীক। একইভাবে বিমানকেও একটি 'মস্ত বাজপাখির মতো' বলা হয়েছে, যা আকাশে উড়ে যায় কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিকতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইসব যান্ত্রিক উপাদান প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দূরত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অন্যদিকে, তৃণভূমিতে সকালের দৃশ্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে মানুষ হাঁটছে, দৌড়াচ্ছে, শ্বাস নিচ্ছে—অর্থাৎ জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা প্রকৃতিকে অনুভব করছে না, বরং ব্যবহার করছে। তারা 'অক্সিজেন খুঁজছে', কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য বা গভীরতা উপলব্ধি করছে না। ফলে প্রকৃতি এখানে একটি উপযোগিতামূলক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই দ্বৈততা—প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বনাম প্রকৃতির ব্যবহারই গল্পটির মূল ইকোক্রিটিক্যাল দিক। অখিলেশ্বর একসময় প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, কিন্তু সমাজ তাকে সেই সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এখন সে নিজেও প্রকৃতিকে একটি কৌশলগত জায়গা হিসেবে ব্যবহার করছে—অপরাধ দমন, অভিযান ইত্যাদির জন্য। গল্পের শেষাংশে আমরা দেখি, অখিলেশ্বর একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে—সে কি গুলি করবে, না করবে না। এই মুহূর্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের নৈতিকতা, ক্ষমতা এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তৃণভূমির অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, এবং তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ—এই দৃশ্যটি এক ধরনের অস্তিত্বগত সংকটের ইঙ্গিত দেয়। সব মিলিয়ে, 'ভোরের আলোয় মধ্যরাত্তির' গল্পটি শুধু একটি পুলিশি কাহিনি নয়, বরং এটি একটি গভীর পরিবেশ-ভাবনামূলক রচনা। এখানে প্রকৃতি এবং মানুষের সম্পর্ককে এক জটিল, দ্বন্দ্বময় এবং বহুস্তরীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃণভূমি, অন্ধকার, আলো, যন্ত্র, শহর—সবকিছু মিলিয়ে একটি এমন জগৎ তৈরি হয়েছে, যেখানে প্রকৃতি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে, আর মানুষ ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। এই গল্প আমাদের ভাবতে বাধ্য করে—আমরা কি সত্যিই প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত, নাকি শুধু তাকে ব্যবহার করছি? এবং যদি এই বিচ্ছিন্নতা চলতেই থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে মানুষের অস্তিত্ব কোন পথে যাবে? এই প্রশ্নগুলিই গল্পটির মূল তাৎপর্য এবং ইকোক্রিটিক্যাল মূল্য।

'ভেজা-তবলার বোল' গল্পটি কেবল প্রাক্তন পৌরপ্রধান বিষ্ণুশঙ্করের ব্যক্তিগত সংকট বা রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কাহিনি নয়; এটি সমকালীন নগরায়ণ ও পরিবেশ-সংকটের একটি তাৎপর্যপূর্ণ আখ্যান। ইকোক্রিটিসিজমের দৃষ্টিতে গল্পটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে প্রকৃতি নিছক পটভূমি নয়; বরং মানুষের জীবন ও সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এক সক্রিয় উপস্থিতি। নগর উন্নয়নের নামে বৃক্ষনিধন, পুকুর ভরাট এবং কংক্রিটের বিস্তারের ফলে মানুষ ও প্রকৃতির দীর্ঘদিনের সহাবস্থান ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। গল্পের শুরুতেই বিষ্ণুশঙ্করের লাগানো শিরীষ, বকুল, রাধাচূড়া ও কৃষ্ণচূড়া গাছের উল্লেখ অতীতের পরিবেশ-সচেতনতার প্রতীক হিসেবে এসেছে।

একসময় এই গাছগুলি শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করলেও বর্তমানে তাদের প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে গেছে। "এই গাছগুলো ওনার আমলে লাগানো; যখন উনি, বিষ্ণুশঙ্কর, এই শহরের পৌরপ্রধান ছিলেন।"[৮]—এই উক্তি অতীত ও বর্তমানের পরিবেশচর্চার পার্থক্যকে স্পষ্ট করে। এর মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা ক্রমশ কমে এসেছে। গল্পে পুকুর ভরাটের প্রসঙ্গ পরিবেশ ধ্বংসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে এসেছে। জলাশয় ধ্বংসের ফলে শুধু একটি প্রাকৃতিক সম্পদই হারিয়ে যায় না, বরং স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র ও জলধারণক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। "ক-বে! আপনার আমলেই..."[৯]—এই সংলাপ পরিবেশ ধ্বংসের দায় নিয়ে প্রশ্ন তোলে। একইভাবে 'উত্তরায়ণ' আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, আধুনিক উন্নয়নের আড়ালে কীভাবে গাছ, পুকুর ও উন্মুক্ত সবুজ পরিসর বিলুপ্ত হয়ে কংক্রিটের শহর গড়ে উঠছে। বিষ্ণুশঙ্করের ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা এবং শহরের পরিবেশগত পরিবর্তন পরস্পরের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। তিনি যেমন নিজের পরিচিত শহরকে আর চিনতে পারেন না, তেমনি শহরও তার প্রাকৃতিক পরিচয় হারিয়েছে। গল্পের শিরোনাম 'ভেজা-তবলার বোল' পরিবেশের হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছন্দের প্রতীক। "সব পুকুর ভরাট, কেউ তিন ফুট ছেড়ে বাড়ি করছেন না।"[১০]—এই সংলাপ মানুষের পরিবেশবিরোধী মানসিকতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। সর্বোপরি, 'ভেজা-তবলার বোল' গল্পটি ইকোক্রিটিসিজমের দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক, অপরিকল্পিত নগরায়ণের কুফল এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে তুলে ধরেছে। প্রকৃতির অবক্ষয় যে শেষ পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্ব ও মানবিকতাকেই সংকটের মুখে ঠেলে দেয়, গল্পটি সেই সত্যকেই শিল্পিতভাবে প্রকাশ করেছে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গল্পসমূহ একত্রে আমাদের সামনে এক গভীর ও বহুমাত্রিক পরিবেশ-বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে। এই গল্পগুলিতে পরিবেশ কেবল প্রকৃতির সীমাবদ্ধ পরিসরে আবদ্ধ নয়; বরং তা মানুষের সমাজ, অর্থনীতি, মানসিকতা এবং নৈতিক চেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। 'মিশ্র পিলু'-তে পরিবেশের দার্শনিক ও অন্তর্জাগতিক রূপ, 'মেহগনি'-তে প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও মানুষের লোভের দ্বন্দ্ব, 'ভোরের আলোয় মধ্যরাত্তির'-এ নগরায়ণ ও যান্ত্রিকতার ফলে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং 'ভেজা-তবলার বোল'-এ উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংস ও মানবিক অবক্ষয়—এই সমস্ত দিক মিলিয়ে একটি সামগ্রিক পরিবেশচেতনা গড়ে উঠেছে। এই গল্পগুলোর বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, পরিবেশের সংকট কোনো বিচ্ছিন্ন বা একমাত্রিক সমস্যা নয়; এটি একটি সামগ্রিক মানবিক সংকট, যার প্রভাব মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির অবক্ষয় যেমন জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে, তেমনি তা মানুষের মূল্যবোধ, সম্পর্ক এবং সামাজিক কাঠামোকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। সাধন চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম শিল্পরীতিতে এই সত্যকে তাঁর গল্পে রূপ দিয়েছেন, যেখানে প্রকৃতি কখনও নীরব সাক্ষী, কখনও প্রতিবাদী শক্তি, আবার কখনও মানুষের অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে এই রচনাগুলি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়—মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহাবস্থানের সম্পর্কেই তাদের টিকে থাকা সম্ভব। আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির নামে যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে, তা যদি অব্যাহত থাকে, তবে তার ফলাফল হবে আরও গভীর সংকট। তাই এই গল্পগুলো শুধু সাহিত্যিক মূল্যেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; এগুলো আমাদের সময়ের এক সতর্কবার্তা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সাধন. গল্প সমগ্র (২ খণ্ড). কলকাতা:করুণা, ২০১১, পৃষ্ঠা ২৮১
২. তদেব, পৃষ্ঠা ২৮৫
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ২৩
৬. চট্টোপাধ্যায়, সাধন. গল্প সমগ্র (২ খণ্ড). কলকাতা:করুণা, ২০১১, পৃষ্ঠা ২৩৩
৭. তদেব, পৃষ্ঠা ২২৯
৮. চট্টোপাধ্যায়, সাধন. গল্প সমগ্র (১ খণ্ড). কলকাতা:করুণা, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৩১
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩২
১০. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৪

Bibliography:

১. কর, শমিত. বিপন্ন পরিবেশ বিপন্ন মানুষ. কলকাতা:মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৫
২. গুপ্ত, শুভেন্দু. পরিবেশ নিয়ে ভাবতে শেখালেন যাঁরা. কলকাতা:পত্রলেখা, ২০১৬
৩. দেবনাথ, দোলা (সম্পা.). সাহিত্য বিচারে পরিবেশকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি. কলকাতা:মিত্রম্, জানুয়ারি ২০১৩

CC BY NC